সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৬ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২৬ ॥ অক্টোবর ২০১৮

https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.4

কবির পাঠে জীবনানন্দ : সংবেদী চেতনার স্বর

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ :

তিরিশের 'আধুনিক' কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সর্বাধিক আলোচিত কবি। তাঁর কাব্য-ভাবনা, কবিসত্তার বিকাশ, স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান করেছেন সমকালীন ও উত্তর প্রজন্মের কবিরাও। জীবনানন্দ-সমালোচনায় একজন পাঠক-কবির অবলোকন, অভিজ্ঞতা– একই সাথে অনুভব-নির্ভর কাব্য উপভোগ এবং সচেতন-জাগ্রত মননের পরিচায়ক। জীবনানন্দের কবিসত্তা আবিষ্কারে কবিকৃত অনুসন্ধান শেষপর্যন্ত কাব্যসমালোচনাকেই সমৃদ্ধ করে। আলোচ্য প্রবন্ধে সে সমালোচনা-রীতিরই প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়াস রয়েছে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। মৃত্যুর পরেই জীবনানন্দ ক্রমাগত বিস্তারিত হয়ে ওঠেন বাংলা ও আন্তর্জাতিক সমালোচনায়ও। জীবৎকালে যাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা সাত, যার দেড় শতাধিক কবিতা মাত্র গ্রন্থিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের আবশ্যিক অংশে পরিণত হওয়া তাঁর কবিতার সমালোচনার সংখ্যা অসংখ্য। সমকাল ও পরবর্তী কালের কবিরাও তাঁর কবিতাকে করেছেন আলোচ্য। প্রায় নব্বই বছর ধরে জীবনানন্দ দাশের আলোচনা-সমালোচনা চলেছে। জীবনানন্দ দাশের সমকালে কিংবা পরবর্তী প্রজন্ম ধরে কবিরা তাঁর কবিতাকে কীভাবে অধ্যয়ন করেছেন সেটা যাচাই করে নেয়া যায় সমালোচক-কবির হৃদ্‌গত সূত্রে কিংবা কবিতা সম্বন্ধীয় তাঁদের নান্দনিকবোধ থেকে।

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার কবি, লেখক ও গবেষকদের মূল্যায়নেই জীবনানন্দ দাশের কবিতার অধ্যয়ন, অনুশীলনের পরিচয় স্পষ্ট। জীবনানন্দের কাব্য আলোচনার শুরু যে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) করেছিলেন, পরে বহুবার এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি তা জানিয়েছেন। সমকালে বুদ্ধদেব ছাড়া জীবনানন্দকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-৬৯)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আলোচনা বা জীবনানন্দ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), অরুণকুমার সরকার (১৯২১-১৯৮০), শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৯২১-২০০০), পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০২১), ভূমেন্দ্র গুহ (১৯৩৩-২০১৫), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০), বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬–), শৈলেশ্বর ঘোষ (১৯৩৮-২০১২), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৪৪–), রণজিৎ দাশ (১৯৫০–), বীতশোক ভট্টাচার্য (১৯৫১-২০১২), জয় গোস্বামী (১৯৫৪–), জহর সেনমজুমদার (১৯৬০–), মঞ্জুভাষ মিত্র প্রমুখ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অনেক কবির কবিতায় জীবনানন্দ দাশের প্রভাব স্পষ্ট; যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-১৯৯৫) প্রথম দিককার কবিতায়, এছাড়া বিনয় মজুমদার, ফণিভূষণ আচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০-২০২১) প্রমুখের কিছু কবিতাতেও। সৃষ্টিশীল কবিরা তাঁদের নিজস্ব কাব্যভাষা গড়ে তুলেছিলেন যদিও, তবুও কোথাও কোথাও জীবনানন্দের প্রভাব লক্ষ না করে পারা যায় না। অমোঘ ও কখনও অনিবার্য সে প্রভাব এড়াতে চেয়েও এক ধরনের ব্যর্থতা কাজ করেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। পঞ্চাশের বিশিষ্ট কবি তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৭) লিখেছিলেন:

স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা করুন।
দু লাইন লিখে নিতে দিন, একটু লিখতে দিন
আপনার উৎপাতে বড়ো ব্যতিব্যস্ত আছি।
আট বছর আগেকার লাশকাটা ঘর থেকে রক্তমাখা ঠোঁটে
প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই– কেন
আমার ঘরের মধ্যে কেন ?
দয়া ক'রে বারান্দায় অপেক্ষা করুন। (উদ্ধৃত, সুজিত, ১৪০১ : ১২৪)

বুদ্ধদেব বসু

কালের পুতুল গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধ তিনটি। জীবনানন্দের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রচনাই বেরিয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়। বিশেষত *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের সিংহভাগ মুদ্রিত হয় এতে। যে দুই-আড়াই বছর 'প্রগতি'র বয়স তাতে তাঁর স্মরণীয় কাজ জীবনানন্দের কবিতার পৃষ্ঠপোষকতা। জীবনানন্দ-বিরোধিতাকে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন; 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দের প্রসঙ্গ সমসাময়িক অন্যদের তুলনায় বেশি পৌনঃপুনিক, যার অনেকটা অংশই প্রতিবাদ, 'প্রগতি'র 'মাসিকী' বিভাগে (১৩৩৪) বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

> পত্রিকার সম্পদনার কাজ যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের হাতে একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্যের ভার থাকে– সে হচ্ছে অজ্ঞাত প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য-সমাজে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সত্যিকারের প্রতিভা কারও পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু আত্মবিস্তৃতির ক্ষেত্র না পেলে তা শুকিয়ে যেতে পারে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু স্মরণ করেন যে, জীবনানন্দের প্রথম যে কবিতাটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে 'নীলিমা'। জীবনানন্দের 'নীলিমা' যখন বের হয় তখন মাত্র সতেরো বছরের বুদ্ধদেব (১৯২৫) ঢাকার একটা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কিন্তু তিনিই সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড় অপরিচিত কবিকে আবিষ্কার করে সামনের সারিতে নিয়ে আসেন। জীবনানন্দ নিয়ে 'প্রগতি' পত্রিকার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রভাকর সেন নামে এক স্নেহার্থী যুবক-কবিকে জানিয়েছেন:

> বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্ভব তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখাবার সুযোগ লাভ করে চরিতার্থ হলাম– বুদ্ধদেব বসুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। (উদ্ধৃত, প্রভাতকুমার, ১৯৯৯ : ২৫১)

জীবনানন্দের বক্তব্য যথার্থ; তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ১৬৭টি কবিতার ১১১টি প্রকাশ হয় বুদ্ধদেব বসুর পৃষ্ঠপোষকতায়। বুদ্ধদেব প্রাথমিকভাবে জীবনানন্দকে চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি' হিসেবে। এক হিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি একথা মানলেও সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবিকেই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য একথা তাঁর মনে হয়েছিল, যখন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থের রূপ পেল, যদিও জীবনানন্দের সমস্ত কবিতাই কোনো না কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা বলে মনে করেন তিনি। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পড়তে পড়তে সমালোচক বুদ্ধদেব কবি জীবনানন্দের মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণা ও নতুন কবিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। কবিতাগুলোতে তিনি আরও খুঁজে পেয়েছেন এক আদিম অপূর্বতা, 'মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন' এই কবিতাগুলোয় ছিলো সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা। জীবনানন্দের কবিতায় এই সুরের সম্মোহন সৃষ্টির ব্যাপারটা বুদ্ধদেব বসু আগাগোড়াই উপলব্ধি করেছেন। এ কারণে বলেন, 'তাঁর কবিতায় যেটি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ব'লে আমার মনে হয় সেটি– একটি সুর, আর-

কিছু নয়।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ৩৬)। অবশ্য কবিত্ব সুর ছাড়া আর কিছু কি?– বুদ্ধদেবের প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব না পড়া জীবনানন্দীয় কবিতাগুলোতে নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে সমালোচকের মত :

> যে দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। ... ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে মনে হয়, যেন এই কবিতাগুলি আঁকাবাঁকা জালের মতোই ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলেছে। এদের আবহতে আছে একটা সুদূরতা ও নির্জনতা; আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোনো আকাশে, অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথা তিনি রচনা করেছেন। ... প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন। (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ৩০-৩১)

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাগতিক রূপকথা রচনার জীবনানন্দীয় পরিতৃপ্তির সাথে পাঠকের রূপমুগ্ধ বিহার কিংবা এ জগতের রস আস্বাদন তখন অল্প হলেও চলছিল। তাঁর কবিতা পাঠককে তখনকার তথাকথিত আধুনিক বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মতো শব্দপীড়িত করেনি। তাঁর কবিতা বুদ্ধদেবের মতে, জাদুমুগ্ধ করে; কিছু কবিতা 'বিশুদ্ধ বর্ণনার অথবা স্মৃতিভারাতুর অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ৪৯-৫০)। যেমন : 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'নির্জন স্বাক্ষর', '১৩৩৩' ইত্যাদি। অন্যদিকে আছে– যেসব কবিতা 'মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।' যেমন– 'বোধ', 'ক্যাম্পে', 'আট বছর আগের একদিন'। বর্ণনার ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনানন্দীয় কবিতার আরও কিছু বিভাজন করেছেন সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর জীবনানন্দ-সমালোচনার সিংহাভাগ জুড়ে রয়েছে কবিতার শিল্প-প্রকৌশল বিষয়ক পর্যবেক্ষণ। জীবনানন্দের বিচিত্র ও সাংকেতিকতাময় উপমা, বিশেষণ ও ভাষা-প্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার তাগিদ অনুভব করলেও বুদ্ধদেব রচিত *কালের পুতুল* গ্রন্থে সংকলিত তিনটি প্রবন্ধে রয়েছে নানা কবিতার আঙ্গিক বা শিল্পরূপ ভাবনা। জীবনানন্দের শব্দ-প্রয়োগ; শিল্প-স্বভাবের নানা বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছেন বুদ্ধদেব বসু। ১৯৩৫-এ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' প্রকাশিত হতেই এতে জীবনানন্দের তেইশটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতে ছাপা হলো 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি। এ ছাড়া ছাপা হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের কবিতা। বুদ্ধদেব 'কবিতা'র সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় সবকয়টি কবিতার ওপর মন্তব্য করে পত্রের

(৩ অক্টোবর শান্তিনিকেতন থেকে বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি) শেষাংশে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' (উদ্ধৃত, সমীর, ২০০৮ : ৯৭)। আরও পরে, জীবনানন্দের প্রথম 'আত্মচারিত্রিক' কবিতাগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাতে লক্ষ করেছিলেন 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'। রবীন্দ্র-উক্ত 'চিত্ররূপময়' অভিধাটি বিশেষভাবে বুদ্ধদেব বসুকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সম্পর্কিত আলোচনাগুলোতে 'নির্জনতার কবি' 'প্রকৃতির কবি' অভিধাগুলো খানিকটা রবীন্দ্র-মন্তব্য প্রভাবিত। *বনলতা সেন* সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখলেন– 'তার বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' এছাড়া ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে জীবনানন্দ অতুলনীয় এবং রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ বলে মনে হয় তাঁর। বুদ্ধদেবের মতে, "গন্ধ ও স্পর্শ দিয়ে অনেক অপরূপ অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্রহ করি; কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জীবনানন্দের মতো এত পূর্ণমাত্রায় আমাদের আর কোন কবি ব্যবহার করেছেন জানি না।" (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ৩২)। জীবনানন্দের কাব্যে রোমান্টিকতার বোধ বিষয় হিসেবে মৃত্যু প্রসঙ্গ এবং কবিতার বর্ণনার ভঙ্গির বিচার করেছেন বুদ্ধদেব। জীবন-প্রত্যয়ের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ এবং সূক্ষ্ম চিন্তায় তা শাণিত ও পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন জীবনানন্দ। কবিতা-পর্যালোচনায় বারবার জীবনের সম্ভাবনাকে খুঁজে নেয়া এই কবির কিছু কবিতা পুনর্বার পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন বুদ্ধদেব বসু।

কাব্যবোধে বুদ্ধদেব বসু অনুভববাদী; তিনি ওইসব কবিতাকেই মূল্যবান মনে করেন যা তাঁর মনে দোলা দেয়। তিরিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিমালাই তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয়কে সর্বাধিক আন্দোলিত করেছিল। আর জীবনানন্দ প্রসঙ্গে *কালের পুতুল* গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধে তিনি যা বলে গেছেন, এ যুগের সমালোচকেরাও কবি সম্পর্কে এর ব্যতিক্রম কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? জীবনানন্দ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমালোচনা কিংবা উদ্ধৃতির সুরস্বাদসৌগন্ধ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কবিত্বের অনুভবে ও সংবেদনশীলতায় আর এক কবির গড়ে তোলা রূপ-কে তিনি করেছেন আরও রূপময়, তথ্যকে পরিণত করেছেন সৌন্দর্যে। এটি বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য সমালোচনারও এক অনায়াস ও অভ্যস্ত ভঙ্গিমা।

পূর্ণেন্দু পত্রী

নির্জনতার কিংবা শুদ্ধতার কবি হিসেবে কেবল নয়, একালের নবীন পাঠকের অভিজ্ঞতায় কবি পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭) চিনে নিতে চান জীবনানন্দ দাশকে; যিনি *রূপসী*

বাংলার পাশাপাশি লিখেছেন *মহাপৃথিবী*, *সাতটি তারার তিমির*-এর মত কাব্যগ্রন্থও। বিশুদ্ধ প্রকৃতির নির্জনতম উপাসক নন তিনি, কবির আত্ম-প্রসারণের ভিন্নতর যাত্রা, পৃথিবীর পথে তাঁর ক্রমিক রূপান্তরিত জীবন-অন্বেষণ চলেছে। ফলে, "নির্মমতম বাস্তবের রণরক্তে আলোড়িত ঐতিহাসিক সময়ে ইতিহাসের দুঃসহ দাহকে সরিয়ে দিতে পারেন নি তিনি।" (পূর্ণেন্দু, ১৪০১ : ২৫৮)। *মহাপৃথিবী*র 'হাওয়ার রাত' পড়তে পড়তে কবি পূর্ণেন্দু পত্রী আবিষ্কার করেন তাঁর কিংবা 'আমাদের' জীবনানন্দ পাঠ; কবির (জীবনানন্দ) বাচনিক অভিজ্ঞতা পরিতৃপ্ত করে এ-কালের কবি-পাঠককে; সমালোচনায় সুস্পষ্ট হয় কবিরই নির্মাণ :

> ... (হাওয়ার রাত) পড়তে পড়তে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকি আমাদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে, প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন এক প্রবল ঘূর্ণীর টানে যেন। আমরাও উড়ে যেতে থাকি যেন কবিতার সমান্তরালে, অথবা কবিতার ডানার উপরে ভর করে। ... গোটা কবিতাটি পাঠ অথবা গোটা কবিতাটির সঙ্গে আমাদের আকাশ পর্যটন শেষ হওয়ার পর আবার আমরা ফিরে আসি নিজেদের চেনা বাস্তবে। তখনো আমাদের রক্তে, মনে, মনের অতলে অনুরণিত হতে থাকে এই কবিতার অনাস্বাদিত পূর্ব অনুরণন, প্রাচীন কোনো গুহার ভিতর থেকে ভেসে আসা মহিম্ন স্তোত্র পাঠের মতো। (পূর্ণেন্দু, ১৪০১ : ২৬১)

পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর *রূপসী বাংলার দুই কবি* (১৯৮০) প্রবন্ধগ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) সাথে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

শঙ্খ ঘোষ

'সৃষ্টি কাজে কবির একাকীত্বের সামর্থ্য অনুসন্ধান' করেছেন শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) তাঁর 'সময়ের সমগ্রতা' প্রবন্ধে। দান্তে বিষয়ক একটি লেখায় জীবনানন্দের কবিতার লাইন ব্যবহার করেছিলেন বলে কোনো এক মার্কসবাদী বন্ধুজনের কাছে ধিক্কার শুনতে হয়েছিল তাঁকে। বামপন্থী কবির কাছেও জীবনানন্দের কবিতা তেমন মূল্য পায় নি কখনও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯) লিখেছেন :

> ... সমস্ত কিছুর মধ্য থেকেও যিনি কিছুর মধ্যেই নন, সেই ভাবান্তরহীন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূসর কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। নাম, সংখ্যা, আকৃতি– তাঁর কাব্যে কথার কথা মাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, আকার থেকে নিরাকারে তাঁর যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ করে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র। বিপরীত

> ভাব গায়ে গায়ে জুড়ে তিনি তাসের ঘর সাজান, তারপর নিজেই নিয়তিপুরুষ সেজে এক ফুঁয়ে সে ঘর উড়িয়ে দেন। (সাহিত্যমেলা : বিভাগোত্তর পূর্ব-পশ্চিম বাংলার সাহিত্য, ১৩৫৪-১৩৫৯, ক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত, শান্তিনিকেতন, উদ্ধৃত, শাহাবুদ্দিন, ২০০১ : ২১৯-২২০)

জীবনানন্দকে ঘিরে প্রগতিশীলদের এ রকম প্রত্যাখ্যান নতুন ব্যাপার নয় সমকালেও। কবির কাছ থেকে দেশ সমাজ-পাঠক কী পেয়েছে– এই অন্বেষণের চেষ্টা রণেশ দাশগুপ্তসহ অনেক মার্কসবাদীই করেছেন। শঙ্খ ঘোষ এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেছেন গভীর নিরপেক্ষতার সাথে– আর আত্মসামগ্র্য অনুসন্ধানের যে পথ কবির থাকে; সেখানে তিনি পেয়েছেন 'অদম্যতা আর আত্মস্থতার শিক্ষায় নিজের কাছে পৌঁছতে পারবার আশ্বাস।' (শঙ্খ, ২০১০ : ৫৪)।

জীবনানন্দের ''কবিতায় আদ্যন্ত এক 'না' '' (শঙ্খ, ২০১০ : ৫৫) ছড়ানো আছে বলে সমালোচক কিংবা পাঠকের কাছে মৃত্যুর, ব্যথার, নিরাশ্বাসের, ক্লান্তির কিংবা ক্ষয়ের কবি হিসেবে তাঁর একটা সহজ পরিচয় তৈরি হয়ে আছে। শঙ্খ ঘোষ একতরফা রূপে খিন্ন-ক্লান্তরূপী কবিকে পাঠ করতে চান নি। চিন্তাক্রমে বিচ্ছিন্নতা আপাত অস্থিরতারই মত; কিন্তু ক্রম-সংগঠিত সময়চেতনা, জীবন-মন্থন আর সমস্ত নিখিলবিশ্বের অভিজ্ঞতা প্রাপ্তি কবির চেতনায়নের স্থিত সমাহিতিই নির্দেশ করে। কিংবা এই প্রক্রিয়াটি কবি শঙ্খ ঘোষ ব্যাখ্যা করেন কবিসত্তার সমগ্রতার উদ্দীপনা হিসেবে :

> জীবনের অন্ধতা নিয়ে বিষাদ, আর তার হাতে পাওয়া অনেক দানের জন্য তাঁর মুগ্ধতা, প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে যাবার আবেশ আর ইতিহাসের স্রোতের মধ্যে নিজেকে বুঝতে চাওয়ার সন্ধিৎসা, এর মধ্যে চলাচলের একটি পথ যে আছে তাঁর কবিতায়, সে-পথ হয়তো খুব সরল চালে এগোয়নি, একের থেকে অন্যের আছে শুধু এক নিরুপায় অভিমুখিতা। জীবনানন্দের কবিতা-পাঠককে জেনে নিতে হয় সামগ্রিকের ওই জটিলতা। (শঙ্খ, ২০১০ : ৫৬)

কবিতায় ব্যক্তিকাল আর মানবকালের খণ্ড ও অখণ্ড সময়-প্রবাহ এবং সময়ের সমগ্রতার বোধের রূপটিও অন্বেষণ করেছেন সমালোচক। মানুষ, মানব, প্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস, সময়ের সাথে ব্যক্তির অন্বয়-অনন্বয়ের প্রকৃতি অনুসন্ধানকে কবিতা সৃষ্টি আর কবিতা পাঠের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জিজ্ঞাসা হিসেবে গ্রহণ করতে চান শঙ্খ ঘোষ। আত্মবিম্ব নির্মিত হয় ব্যক্তিকাল, মানবকাল আর বিশ্বকালের সম্পর্কের মধ্যে, আঘাত-প্রত্যাঘাত কিংবা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের এই সম্পর্ক যেখানে জড়িয়ে যেতে থাকে আমাদের সমাজ-ইতিহাস আর প্রকৃতি– কবিতা সৃষ্টির পথে এই সবকিছুর সাথেই এক অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে জড়িয়ে যান কেউ কেউ। শঙ্খ ঘোষের মতে, "সেই সবকটির-ই ইঙ্গিত দেন

জীবনানন্দ, যখন তিনি বলেন 'মহাবিশ্বের সত্যের মতো' কিংবা যখন 'মানব সমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায়' দেখতে চান কিংবা বলেন, "প্রকৃতি, সমাজ ও সময় অনুধ্যান'-এর কথা। ... এক ঢেউয়ের জল অন্য ঢেউয়ের মধ্যে গড়িয়ে যায় যেভাবে, অচিহ্নিত মিশে যায় ওতপ্রোত, জীবনানন্দের কবিতায় সমগ্র-সমস্ত এই 'কাল' (মানবকাল-বিশ্বকাল-ব্যক্তিকাল) তেমনি জড়িয়ে যায় ভিতরে ভিতরে। আর সেই জন্যেই 'সমাজের মধ্যে প্রকৃতি, জীবনের মধ্যে মৃত্যু, ভরসার মধ্যে নিরাশা একযোগে গলে যেতে থাকে তাঁর কবিতায়, তার কোনো একটিকে আলগা করে দেখার কোনো মানে থাকে না আর।" (শঙ্খ, ২০১০ : ৫৮)।

আবহমান সময়ের প্রশান্তি কিংবা, জীবনের সঙ্গে কবির সর্বাত্মকভাবে মিশে থাকবার ধরনটিকে শঙ্খ ঘোষ গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশি, আর নিরুৎসাহ করেছেন বিশেষ কোনো শ্রেণিচিহ্নিত করে জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করতে। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতার সবকিছুকেই দ্বিকোটিতে সাজিয়ে দেখবার অভ্যাসে বিড়ম্বিত হয় কবিতার অন্তর্হিত সামগ্র্য বোঝার ক্ষমতা। "সেই বিভাজন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এমন একটা জগৎ তৈরি করে তোলেন জীবনানন্দ যেখানে একই সত্তা পেয়ে যায় জীবনের মধ্যে মৃত্যু, আশার মধ্যে নিরাশা, সঞ্চারের মধ্যে স্তব্ধতা; যেখানে 'অসম্ভব বেদনার সাথে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ'। আর এই ওতপ্রোত জগৎ থেকেই তৈরি হয়ে ওঠে আমাদের সত্যের পরিচয়।" (শঙ্খ, ১৪০৫ : ৫২০)। সুতরাং সময়ের যে 'আশ্চর্য সমগ্রতার' কাছে আস্তে আস্তে আত্মসমর্পণ করেছিল 'মাল্যবানের মন' (শঙ্খ, ২০১০ : ৫৯) শঙ্খ ঘোষের জীবনানন্দ-পাঠও সেই সামগ্রিকতার খোঁজে অন্তর্দীপ্ত এক কবি-মনের অঙ্গীকার হয়ে ওঠে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের (১৯৩৩-২০২০) *জীবনানন্দ* (১৯৮৯) গ্রন্থটি একটি সমৃদ্ধ সমালোচনাগ্রন্থ। 'স্নাতকোত্তর ছাত্রদশা ও তারুণ্যের স্পর্ধায়' জীবনানন্দের তৎকালীন প্রকাশিত কবিতাগুলোকে 'নির্বস্তুক' আখ্যা দিয়েছিলেন কবি অলোকরঞ্জন এবং পরবর্তী সময়ে জীবনানন্দের মুখোমুখি হওয়া এবং 'কবিতার পুরো ব্যাপার' নিয়ে পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা বিষয়ক স্মৃতিচারণ তিনি *জীবনানন্দ* গ্রন্থের মুখবন্ধে করেছেন। সংগীতজ্ঞ বন্ধু ভাস্কর মিত্রের অনুরোধে জীবনানন্দের 'কবিতার অন্তর্নিহিত গানের দিকটাও' (ভাস্কর মিত্রের বক্তব্য অনুযায়ী) ভোলেন নি অলোকরঞ্জন, ফলে কবির হাতে লেখা এ গ্রন্থ হয়ে ওঠে সুরের অবয়বে কবিতার নান্দনিক সমালোচনা-চিত্র। যদিও 'অনর্পিত নান্দনিক ও শুদ্ধ অ্যাকাডেমিক, এই দুই ধারার মানুষজনের কাছেই বিবেচিত হতে পারে' এরকম একটি গ্রন্থই লিখেছেন কবি। কবি হিসেবে জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতা, নির্জনতার ব্যাখ্যায় অলোকরঞ্জন লিখেছেন :

> কবিতা রচনার জন্য কবিকে পদ্ধতিগত এক ধরনের দূরত্ব, একরকম অজ্ঞাতবাসের প্রাতিভাসিক ব্যূহ, নির্মাণ করে নিতে হয়, নান্দনিক সেই বোধ থেকেই তিনি নিঃসঙ্গতাকে আঙ্গিকের মতন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কবিতা-সংক্রান্ত তাঁর স্বগত কথিকাগুলি পড়লেও দেখা যাবে 'সমাজ' শব্দটি তাঁর চিন্তা ও চৈতন্যে কিরকম বিপুল প্রাধান্য পেয়েছে। (অলোকরঞ্জন, ২০০৭ : ১১)

ভাষার অন্তর্গত অথচ অতিশায়ী শক্তির পরাক্রমেই 'সৃষ্টির ক্রমউন্মোচনের রহস্যময়তা' (অলোকরঞ্জন, ২০০৭ : ২৬) জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শৈশব থেকে কলেজ জীবন পর্যন্ত বেড়ে ওঠার স্মৃতিতে জীবনানন্দের নাম কমই উচ্চারিত হত বলে স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ 'আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার'-এ লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)। তাছাড়া 'আধুনিক কবিতা ব্যাপারটাই যেন ছিল কোনও গোপন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাংকেতিক প্রচার পত্রের মতন।' (সুনীল, ২০১৫ : ১৬)। জীবনানন্দের কবিতা প্রথম পড়ার পর 'বিমূঢ়, স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকা', 'মন্ত্রমুগ্ধতা, ভূতগ্রস্ততা' ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার কথা স্মৃতিচারণে লিখেছেন সুনীল; আর ঠিক যে অর্থে কবিতাপাঠে এই রহস্যময়তায় অনুভব, তা 'শুধু কবিতারই নির্মাণ' বলে উপলব্ধি করেছেন তিনি। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পাঠ শেষে জীবনানন্দের ভাষারীতি কিংবা শব্দ-স্বরের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে সুনীল লিখেছেন–

> এমন আবেশময়, এমব মায়াবী কবিতা পাঠ যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার মনে হয়েছিল সেই বয়সে। ইংরেজি 'সেনসুয়াস' শব্দটি যেন এই রকম কবিতা সম্পর্কেই সঠিক ব্যবহার করা যায়। ... জীবনানন্দ দাশ কখনও উচ্চকিতভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেননি। কল্লোলের অন্যান্য কবিরা যতই চ্যাঁচামেচি করুন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই স্বাভাবিক উত্তরসূরি। কিন্তু জীবনানন্দের ভাষারীতিই রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক দূরের। ফসলের স্তন থেকে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের জল পড়ার বর্ণনা লেখার সাধ্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের। (সুনীল, ২০১৫ : ১০)

বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তবে তরুণতম কবিদের মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) 'প্রথম প্রকাশ্যে জীবনানন্দকে নিয়ে একটা হইচই শুরু করে' (সুনীল, ২০১৫ : ১০)। 'প্রজ্বলন্ত সূর্য এবং *সাতটি তারার তিমির*' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাথে জীবনানন্দের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সুনীল এবং জীবনানন্দের কবিতা বিবেচনায় তাঁর প্রতীতি– কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নয়, সমসাময়িক কবিদের থেকেও দূরে জীবনানন্দের কবিতার আঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'চিত্ররূপময়' অনেক কবিতার পঙ্‌ক্তি আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ*, *শেষ সপ্তক*, *পত্রপুট*, *শ্যামলী*, *আকাশ প্রদীপ*,

নবজাতক, *সানাই* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার সাথে। সুনীলের মতে, 'পুনশ্চ' পর্বে ছন্দকে বর্জন করে গদ্যকে কবিতার ভাষার উপযোগী বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, পরে তার অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সাথে আধুনিকতা মানেই বাস্তবতার কুৎসিত কদর্য বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি নয় কিংবা আধুনিকতা মানে শুধুই বাস্তবতা নয়, সেটাও স্পষ্ট করেছেন তিনি :

> আধুনিকতা মানে শুধু বাস্তবতা নয়, তা ক্ষণে ক্ষণে পৌঁছে যায় পরাবাস্তবতায়। অনুভবের নানান স্তর এসে পড়ে সেখানে। পশ্চিমী দেশগুলির চিত্রকলার বিবর্তনে দেখতে পাই, অনেক শিল্পী অত্যুৎসাহে পরাবাস্তবতার স্তরও পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ বিমূর্ততায়, যার ফল সুখকর হয়নি। সম্পূর্ণ বিমূর্ততায় স্রষ্টার সঙ্গে দর্শক-পাঠকদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, সৃষ্টির উদ্দেশ্যই নষ্ট হয় তাতে। ... জীবনানন্দ দাশ তা আগেই বুঝেছিলেন। তাই তাঁর কবিতা কখনও বাস্তবচ্যুত নয়, মাঝে মাঝে বিমূর্ততার ছায়া এসে রহস্যের বাতাবরণ দিলেও আবার ফিরে আসে চেনা জগতে। তাই পাঠককে বিমুখ করে না। (সুনীল, ২০১৫ : ২১)

জীবনানন্দের কবিতার বর্ণনার ভঙ্গি, উপমার কারুকাজ শব্দ ব্যবহারের শিল্প-সৌকর্য, ক্রিয়াপদের স্বতন্ত্র ব্যবহার, চিত্রকল্পমূলক পরিচর্যা– যেখানে চাক্ষুষ দৃশ্যের সাথে মিশে যায় রহস্য– ইমপ্রেশনিস্টের মত আঁকা ছবি ইত্যাদি বিষয়ে সুনীলের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন রয়েছে। জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কাব্যভাষা বিষয়ে সুনীলের মত :

> জীবনানন্দের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি এমন একটা কাব্যভাষা আনতে চাইলেন, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সচেতনা নেই।... বাংলায় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে একঘেয়েমি এসে যায়, কবিতায় সেই জন্য শেষ শব্দে ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু জীবনানন্দ যেন জোর করেই 'ফেলিয়াছি'র মতন একটা এলানো ক্রিয়াপদ বসালেন। একটু পরে আবার লিখলেন, 'বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে'– যেন স্বগতোক্তির মতন পঙ্‌ক্তিগুলি বলে যাচ্ছেন। (সুনীল, ২০১৫ : ৩৬)

কখনও অর্থের আপাত সংযুক্তিবিহীন, পারম্পর্যহীন পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে, কখনও শব্দের পারস্পরিক বৈচিত্র্যময় ব্যবহার করে, যা মূলত উপমা বা রূপক নয়, 'অবচেতনের বহিঃপ্রকাশ কিংবা বিমূর্ত কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করে জীবনানন্দ বাংলা কবিতার আকৃতিটাই বদলে দিলেন।' (সুনীল, ২০১৫ : ৩৭)। বিমূর্ত আর বিশুদ্ধ কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক বিতর্ক কিংবা কবিতায় সর্বসাধারণের সুবোধ্য, জীবনাশ্রয়ী বক্তব্যের প্রতিফল, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর ইত্যাদি প্রসঙ্গেও জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃতি চিহ্নিত করেছেন সুনীল। *ঝরা পালক* থেকে *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতার ক্রমিক রূপান্তর বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তিনি। তাঁর কবিসত্তার সার্বিকতা অনুসন্ধানে পাঠক সুনীলের প্রত্যয় :

> এ রকম কবি যে কোনও দেশেই বিরল, যিনি প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরণ প্রবর্তন করে যেতে পারেন। এবং যাঁর কবিতা বারবার পড়লেও পুরনো হয় না। (সুনীল, ২০১৫ : ৪২)

সুনীল গুরুত্ব দিয়েছেন জীবনানন্দের কবিতা বারবার পড়ার বিষয়টি; তিনি মনে করেন বক্তব্যভারাক্রান্ত কবিতার দুর্বলতা এই, তা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না; অল্পক্ষণেই তার আকর্ষণ চলে যায়। ইস্তেহারধর্মী কিংবা বক্তব্যপ্রধান কবিতার গুরুত্বকে স্বীকার করেও কবি সুনীলের কাছে কোনো রচনার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে শিল্পের ভেতরে থাকা সাবলীল রহস্যের সগুণে– যা ক্রম উদ্বোধিত আকর্ষণ জন্ম দেয়। তাঁর মতে, "জীবননান্দ দাশ একজন অতুলনীয় মায়াবী কবি।" (সুনীল, ২০১৫ : ৪৩)। সহৃদয় কাব্যতত্ত্ববিদের মতো অপার এই বিস্ময়বোধ বা শিল্পের অনির্ব্বচনীয় রহস্যের খোঁজ ভারতীয় ধ্রুপদী কাব্যশাস্ত্রের অনুরণন হলেও জীবনানন্দ সম্পর্কে সুনীলের এই মুগ্ধতা তাঁর একার নয়। সমালোচকের মতে "কথারা কী করে সম্মোহন সৃষ্টি করে তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতা। কারণ মিশ্র ভাষারীতির অন্তর্বয়ন ঘটিয়ে তিনি আবেশ ঘনিয়ে তোলেন, প্রকরণের দেহে বিছিয়ে দেন হৃদয়ের 'নির্ধুম আনন্দ'– তা রক্তের মধ্যে অবিরাম খেলা করে।" (আকতার, ২০১৮ : ১৪)।

ধূসর পাণ্ডুলিপি (সিগনেট সংস্করণ) প্রথম দেখে কবি বিনয় মজুমদারের (১৯৩৪-২০০৬) মনে হয়েছিল 'ধূসর শালপাতায় জড়িয়ে যেমন মাংস বিক্রি করে, তেমনি দুখানি ধূসর মলাটের মধ্যে কবির হৃদপিণ্ড জড়িয়ে' (বিনয়, ১৪০১ : ২৩৪) তাঁকে দেয়া হয়েছে। কবি জানাচ্ছেন, কোনো কোনো কবিতা জীবনানন্দ দাশের মতো করে লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বহুবার সংশোধনের পরেও তা সম্ভব হয়নি এবং মনে হয়েছে 'জীবনানন্দকে নকল করা এত সহজ ব্যাপার নয়।' (বিনয়, ১৪০১ : ২৩৪)।

জীবনানন্দের কবিতার নতুন ভাব অনুসারী পাঠ করেছেন কবি জহর সেনমজুমদার (১৯৬০–)। তাঁর *জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য* (প্র. প্র. ১৪০৫) গ্রন্থটি জীবনানন্দের কবিতা সমালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আবহমান কাল ধরে যে সত্তা বনলতার দিকে হেঁটে আসছে তার বিপুল শূন্যতা আর নৈঃসঙ্গ কবির একার নয়; মানবের আবহমান জীবনধারাই এই সত্যকে সপ্রমাণ করেছে। জহর সেন কবিসত্তার বোধকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : '... জীবনানন্দের কবিতায় দেখা দিল ইন্দ্রিয় সংবেদী এক কল্পজগৎ, যেখানে ব্যক্তি বা সত্তার গহনবাসী আবহমান বোধ আবহমান সময়-চেতনার মধ্য দিয়ে বৈনাশিক মানব-বিষাদকে বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনে; অপরাহত সেই বোধ।' (জহর, ১৯৯৩ : ১২)। অর্থাৎ সেই মানববিষাদের কেন্দ্রস্থলে একদিকে থাকে 'দারুচিনি দ্বীপ', অন্যদিকে 'লাশকাটা ঘর'। এই 'বাইনারি অপজিশনকে' জীবনানন্দ মানবজীবনের সত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

বৃত্তাকার অনুশাসন নেই যাঁর (জহর সেন) কবিতায়, সেই কবির ভিন্নধর্মী আলাপনে পাই জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত পশুর মোটিফেরও ব্যাখ্যা। তাঁর মতে :

> তিনি অন্তরস্বরূপ, সমাজস্বরূপ এবং পৃথিবীস্বরূপের গভীরে পৌঁছেছেন বিভিন্ন রকম জীবজন্তুদের কবিতায় এনে এবং জীবজন্তুদের মাধ্যমেই তুলে ধরেছেন আমি-সত্তার বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন সংকট, বিভিন্ন কারুকার্য।... জীবনানন্দ পরবর্তীকালে সেই একমাত্র কবি, যিনি জীবজন্তুদের ভিতর দিয়ে আসলে নিজের ভিতরে নিজেই ক্রমাগত পরিক্রমারত এবং আত্মসংকট থেকে আত্ম-অতিক্রমণের দিকে যাবার কালে বারবার আলো অন্ধকারে জীবজন্তুদের অমোঘ উপস্থিতিকে কবিতায় বিশেষ মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। (জহর, ২০১০ : ১৪৯)।

খ.

পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু হওয়া বাংলাদেশের জীবনানন্দ-চর্চা অব্যাহত রয়েছে সমকালেও। *জীবনানন্দ সমীক্ষণ* (২০০০) গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন :

> ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৯৯– বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ বৎসরে জীবনানন্দ কবিতা ও পরে অন্যান্য অপ্রকাশিত রচনা ক্রমে সমালোচকদের নিবিড় পর্যালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। বাংলাদেশে এই আলোচনার জোয়ার আসে ১৯৬৪ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকায় জীবনানন্দের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে পঠন পাঠন শুরু করার পর। ... এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লিখেন বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট জীবনানন্দ-গবেষক অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ ('সাহিত্য পত্রিকা', শীত ১৩৮৮, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং বিশিষ্ট জীবনানন্দ-গবেষক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক ডক্টর ক্লিনটন সীলি (বর্ষা ১৩৮৯)।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের কবি সমালোচকেরা জীবনানন্দের কবিসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'বাংলা কবিতার পটভূমিতে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ের প্রশ্নেও গভীর মনোযোগের পরিচয় এ-সময়ের বেশ কিছু লেখায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' (রফিকউল্লাহ, ২০০১ : ১১৭)। সৈয়দ আলী আহসানের (১৯২০-২০০২) 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে', হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩৫-১৯৮৩) *আধুনিক কবি ও কবিতা* (১৯৬৫) গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের কাব্যালোচনা রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা রয়েছে সুপ্রচুর। জীবনানন্দকে নিয়ে লিখেছেন কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪, শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আহমদ রফিক (১৯২৯–), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

(১৯৩৬-২০২০), বেলাল চৌধুরী (১৯৩৮-২০১৮), খালেদা এদিব চৌধুরী (১৯৩৮-২০০৮), মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩-), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), মাহবুব সাদিক (১৯৪৭-), হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) প্রমুখ। এছাড়া কবি নন এমন জীবনানন্দ-সমালোচকের সংখ্যাও অনেক বেশি।

শামসুর রাহমান

কবিজীবনের শুরুতেই তরুণ শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পাঠের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন যে, 'এক মোহন ভূতগ্রস্ততায় সারারাত জেগে' (শামসুর, ২০০১ : ২১) তিনি পড়েছেন কাব্যটি এবং নির্দ্বিধায় জানান:

> জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম নতুন করে আর সারাক্ষণ আমার একথা মনে হতে থাকল যে আমি যা লিখতে চাই, ইনি তা আগেই অত্যন্ত স্মরণীয়ভাবে লিখে ফেলেছেন। এটা এক হিসেবে মর্মপীড়ারও কারণ। কবুল করতে দ্বিধা নেই, আমি *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পাঠ করার পর থেকেই জীবনানন্দ দাশের দখলে চলে গেলাম, যার চিহ্ন আমার প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত। তখন আমি আমার যৌবনের উষাকালে, তাঁর কনিষ্ঠ সহজীবীদের একজন, একলব্যের মতো দূর থেকে তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলাম।' (শামসুর, ২০০১ : ২১)।

তাঁর কবিতাকে রহস্যসমৃদ্ধ, আশ্চর্য রূপসী কবিতাই মনে হয়েছে শামসুর রাহমানের, মনে হয়েছে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা যেন কবির সঙ্গে 'ঘুরে ঘুরে একা কথা বলে যায়', 'চেতনায় বয়ে যায় জীবনানন্দীয় ঝরনাধারা, যা অত্যন্ত নির্জন এবং মায়াবী।' (শামসুর, ২০০১ : ২১)। জীবনানন্দীয় কবিতার এই ইন্দ্রজালে বা মোহমায়ায় কেবল কবিরাই নন, বিদগ্ধ সমালোচক ও সাধারণ পাঠকেরাও এই নান্দনিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) ষাটের দশক এবং পরবর্তী কালেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক যিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-গবেষণা, জীবনী, নাটক/কাব্যনাটক, স্মৃতিকথা, অনুবাদ-কবিতা, সম্পাদনা- সব ধরনের রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন প্রবন্ধ বা সমালোচনা-প্রবন্ধ; বিশেষত কবি ও কবিতা বিষয়ে তাঁর রচনাপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন। বাংলাভাষার প্রধান কবিদের প্রায় সকলেই তাঁর কলমে বিশ্লেষিত ও বিবেচিত হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ শুদ্ধতম *কবি* (১৯৭২)। 'আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলাদেশে জীবনানন্দ-চর্চার ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন।' (রফিকউল্লাহ, ২০০১ : ১১৭)।

'এক স্বজ্ঞা ও সংবেদনই জীবনানন্দকে আলাদা করে দিয়েছিল অন্য সবার থেকে' বলে মনে করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (মান্নান, ২০০১ : ২২৯)। 'প্রথম গ্রন্থেই জীবনানন্দ মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন বিপুল জীবনময়তা ও মৃত্যুময়তা আর তাঁর সমস্ত স্বাদ-গন্ধ নিয়ে।' (মান্নান, ২০০১ : ২৩০)। *শুদ্ধতম কবি* গ্রন্থের বেশ কিছু নিবন্ধ জীবনানন্দ দাশের কবিতার 'শারীরবৃত্তিক' আলোচনা বলে (মান্নান, ২০১১ : ১১) দাবি করেছেন মান্নান সৈয়দ। একথা সত্য যে, কবিতা-সমালোচনায় বিষয়বস্তুভিত্তিক আলোচনার চেয়ে জীবনানন্দের কবিতার রূপ– বিশেষত বর্ণ, ব্যবহৃত শব্দ (অক্ষর), অব্যয়, ছন্দ, রূপকল্প; এক কথায় কাব্যভাষা বিষয়ক প্রকরণধর্মী বিবেচনাই পুরোভাগে রয়েছে *শুদ্ধতম কবি* গ্রন্থে। কেন শুদ্ধতম কবি অভিধা– সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সূত্র খুঁজেছেন জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধীয় চিন্তা বা বিশেষ কবিদৃষ্টির ভেতরে। মান্নান সৈয়দের মতে, এই শুদ্ধতা কোনো কল্পনার শুদ্ধতা নয়, বরং 'কবিতা রসেরই ব্যাপার' বলে জীবনানন্দ রসবিশিষ্টতাকে কবিতার আদি শুদ্ধতা অর্থে প্রয়োগ করেছেন। (মান্নান, ২০১১ : ১৯)। কেবল আনন্দ, সৌন্দর্য ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ কবিতার সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে জীবনানন্দীয় এই কাব্যতত্ত্বের নানা ব্যাখ্যা সমালোচনা আছে; মান্নান সৈয়দ অবশ্য গুরুত্ব দিয়েছেন জীবনানন্দের *কবিতার কথা* গ্রন্থের কয়েকটি উদ্ধৃতিকে; বিশেষত সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সাথে কবিতার পার্থক্য নির্দেশ করে কবি লিখেছিলেন যে "...প্রথমোক্ত জিনিশগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতার তা আছে।' (জীবনানন্দ, ২০১৭ : ১৭)। কাব্যচিন্তা ও কবিতার অনুশীলনে জীবনানন্দ সমকালে কী করে আলাদা হচ্ছিলেন, সমালোচক মান্নান সৈয়দ তা চিহ্নিত করেছেন পরিভ্রমণকারী কবির ক্রম-রূপান্তরের যাত্রার ইতিহাস ধরে। কবির কল্পনাশক্তি কীভাবে কাজ করে, মনন-আবেগের স্বকীয় সে উদ্ভাস ব্যাখ্যাত হয় মান্নান সৈয়দের কবিত্বেও :

> ইতিহাস-ভূগোলের স্বপ্নিল ভ্রমণ তাঁকে (জীবনানন্দকে) অর্ধজীবনে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 'রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে।' উত্তরবর্তীকালে তিনি প্রধান সম-সমাজ-দেশ-কাল ভাবনায় নিজেকে নিঃসৃত করেছেন, যার সূচনা *সাতটি তারার তিমির* থেকে।
>
> এই ইতিহাসভূগোলবিহার জীবনানন্দকে আর এক স্বপ্নে উত্তীর্ণ করেছিল, অথবা স্বপ্নপ্রয়াণই সাহায্য করেছিল সেই লোকে যেতে, যে-স্বপ্ন য়ুং-এর উচ্চারণে 'ব্যক্তি-মানুষের মিথ।' ... তাঁর কবিতায় এই স্বপ্নোত্থান এরকম কার্যকরী যে, তা অনেক সময়েই যুক্তিগ্রথিত নয়, বরং স্বপ্নসমাহৃত। – জীবনানন্দের কবিতায় এইভাবে কাজ গেছে বিচিত্রবিধ কল্পনার অপরূপ অর্কেস্ট্রায়ন। (মান্নান, ২০১১ : ১৩১)

সময়-ইতিহাস পরিভ্রমণ মূলত প্রত্যেক কবিরই বৈশিষ্ট্য বলে জানান মান্নান সৈয়দ- 'প্রত্যেক কবি নিজের ভেতর দিয়ে একবার মানববাহিত আদ্যন্ত কাল পরিভ্রমণ করে

আসেন; অতিজাগতিক ও মহাসময়বাহী একটি পৃথিবী কবির ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।' (মান্নান, ২০১১ : ৩৭)। এ অভিযাত্রিকতা এক অন্তঃপ্রেরণারই মত; যা জীবনানন্দকে দিয়েছে পরিশুদ্ধ আবেগের দ্যোতনা। জীবনানন্দ সমীক্ষায় মান্নান সৈয়দ তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল, সমকালীন অনেক ইংরেজ কবির সাথে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আলোসম্পাতের পরেও প্রাতিস্বিকতাই মৌল অবলম্বন হয় শিল্পীর; যে 'প্রাতিস্বিকতা বিজনতারই দ্বিতীয় অভিধা' (মান্নান, ২০১১ : ১২০) এবং নব এক প্রজ্ঞা যা একক ও অবিবর্ত নয়, কেবল কবির স্বচেতনায় মর্মস্থ ও প্রতিষ্ঠ। মান্নান সৈয়দের স্বীকৃতিতে উচ্চারিত হয় কবিত্বের সংবেদনার সমবায়ী স্বর :

> বাংলা কাব্যেতিহাসে জীবনানন্দ দাশ প্রথম বিমূর্ততার বিশাল আকাশ মুক্ত করে দিলেন যেন আমাদের চোখের উপর থেকে ক্লিশে-ক্লিষ্ট বহুযুগমলিন একটি পরদা সরিয়ে ফেলে। সাম্প্রতিক পাঠক যে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথের চেয়ে জীবনানন্দের কাব্যের আস্বাদ অধিক নিকটবর্তীভাবে পায়– চেনা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আয়তন অনুভব করে, তার কারণ উপ্ত এখানেই ; এ কালের পাঠকের চৈতন্যের জমি থেকে তাঁর কবিতা রচিত। ... কাব্যভাষাও ক্রমাগত পরিবর্তমান; যুগ-রুচি এই ছাঁচ কেবল দেশ-কাল-সমাজের সমকালীন চাপেই তৈরি হয় না; তার পিছনে থাকে আরো বিচিত্রবিধ শিল্পসম্ভব চাপ, তাগিদ ও সুপারিশ। উক্ত নব রুচির কাছে এসে জীবনানন্দের কাব্যাকাশ ও কাব্যভূমি পৃথকতা উপার্জন করে নিল; প্রায় নিঃশব্দে তিনি কবিতার মর্মপৃথিবীতে ঢুকে একটি বিনীত হাতুড়ি দিয়ে এতকাল-বাহিত অজস্র পরিপ্লাবী যত-সব কাব্যপ্রচল ভেঙে দিলেন। (মান্নান, ২০১১ : ১২১)

মান্নান সৈয়দের সমালোচনা প্রায়ই এরকম 'ইমপ্রেশনিস্টিক' (বিম্বধর্মী) রূপ ধারণ করেছে। তবে একজন দায়িত্বশীল সৎ সমালোচকের মতই তিনিও অন্বেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন জীবনানন্দের কবিতার আরাধ্য ও প্রকৃতি– অন্তরঙ্গ পাঠে অর্জন করে নিয়েছেন তাঁর কবিতার নানা অভিজ্ঞান। অনুভব করেছেন কী করে আধুনিক মানুষের অন্তরাত্মা মিশেছে তাঁর কবিতায়– 'আজকের মানুষ পেয়েছে তার যন্ত্রণার ছবি, কিন্তু একই সঙ্গে আনন্দের চিত্রও।' (মান্নান, ২০১১ : ৩৩৮); কিংবা বিশেষ দেশকালের পরিবেষ্টন-পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে কবি পৌঁছান মানবিকতার বোধে- 'মানুষের মৃত্যু হলে/তবুও মানব থেকে যায়'- এ কোনো শাস্ত্রবাণী নয়, নয় পড়ে-পাওয়া কোনো বিষয়– 'জীবনানন্দের কবিতা শেষপর্যন্ত দ্বন্দ্বময় পরিবেষ্টনের উপরে উঠে গিয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করেছে।' (মান্নান, ২০১১ : ৩৪৩)। অতিসংবেদী কবির লেখায় দ্বন্দ্বময় নৈরাজ্য, নির্জন নৈঃসঙ্গ্য, সুপ্রচুর অন্ধকার আর অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুচেতনার সমান্তরালে প্রস্ফুটিত হয়। 'ব্যক্তিমানুষের মৃত্যুর পরেও মানবের ধারাবাহিকতায় আস্থা স্থাপন করেছিলেন তিনি।' 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে মান্নান সৈয়দ লিখেন–

'রেডিওতে পঠিত সর্বশেষ কবিতায় ('মহাজিজ্ঞাসা') উচ্চারণ করেছিলেন 'ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস– যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ/ বিছিয়ে অসীম করে রেখে দিয়ে যায়।' জীবনানন্দের কবিতা সেই তিন ফুট অসীমের জয়গান। জন্ম আর মৃত্যু দুই কালো সাগরের মাঝখানের শ্যামল ভূখণ্ডে এক অবিনাশ মহাতরু।' (মান্নান, ২০১১ : ৩৩১)।

শুদ্ধতম কবি গ্রন্থে জীবনানন্দের কবিতার একান্ত প্রকরকেন্দ্রিক সমালোচনাই অনেক বেশি। কবিতায় পরাবাস্তব চিত্রকল্পের ব্যবহার কিংবা *বনলতা সেন* ও *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি পরাবাস্তব কবিতা সম্পর্কে মান্নান সৈয়দের বক্তব্য হল– আপাত দৃষ্টিতে অলগ্ন, পরম্পরারহিত মনে হলেও পুরো কবিতা পড়ে উঠলে একটি অভিঘাতের সামগ্র্য সৃজিত হয়। আঁদ্রে ব্রেতোঁ যাকে বলেছিলেন 'Marvellous', জীবনানন্দ যাকে বলেছেন 'আশ্চর্যবিস্ময়', 'জীবনানন্দের এইসব কবিতা তারই কারণে হয়ে ওঠে আনন্দ আধার ও কান্তিনিকেতন।' (মান্নান, ২০১১ : ১২৯)। জীবনানন্দের অবিরল উপমা প্রয়োগকে 'দৃষ্টিগ্রাহ্য' ও 'আত্মিক' দুই রকমের মনে হয়েছে সমালোচকের, এছাড়া শব্দ ব্যবহার 'আবৃত্তপদ, গীতলতা, চিত্রলতা'র ক্রম পূর্ণতা কেবল বহিঃসময় প্রভাবের ফল নয়, 'কবির অন্তঃসময় সম্পাতীও।' (মান্নান, ২০১১ : ৩৮)। মিল, অনুপ্রাস, ছন্দ, পুনরুক্তি, বিকল্প শব্দ ও বাক্য ব্যবহার কিংবা 'অবিরল শব্দ পঙ্‌ক্তি-স্তবক পরিবর্তনে পরিশোধনে তাঁর নিগূঢ় জটিল বহুমাত্রিক মানসের অনেকরকম আলোছায়ার সম্পাত কাজ করে যায়। (মান্নান, ২০১১ : ৩৩৫)। ক্রিয়াবাচক শব্দ ও বিশেষণ শব্দের নতুন ও বিস্ময়কর ব্যবহার করে জীবনানন্দ যেন 'বাংলা ক্রিয়াপদের দীনতা যেন খানিকটা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।' (মান্নান, ২০১১ : ৪৪)। বিশেষণ ব্যবহারের নানা উদাহরণ টেনে সমালোচক সেই দ্রষ্টব্যকে অভিহিত করেছেন 'প্রত্যাশিত ও চোখ-ধাঁধানো', এতকাল-অভ্যস্ত বাংলা কবিতাবিশ্বে ম্যাজিকের মতো, নিষ্ণাত ও আশ্চর্য, কুশলী ও অনির্বচন প্রয়োগ।' (মান্নান, ২০১১ : ৪৬)। মান্নান সৈয়দ চিহ্নিত জীবনানন্দীয় বিশেষণের এরকম একটি গুচ্ছ :

১. হলুদ লতার গন্ধে ভরে ওঠে অবিচল শালিকের মন ['সিন্ধুসারস', *মহাপৃথিবী*]

২. চাঁদ ডুবে গেলে পরে প্রধান আঁধারে তুমি অশথের কাছে একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা–একা। ['আট বছর আগের একদিন', ঐ]

৩. আরো-এক বিপন্ন বিস্ময় [ঐ]

৪. একটি বাদুর দূর স্বোপার্জিত জ্যোস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়। ['কবিতা', *সাতটি তারার তিমির*]

৫. সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার খোঁপা বেঁধে নিতে আসে। [১৯৪৬-৪৭, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*]

৬. আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ। ['ধান কাটা হয়ে গেছে', *বনলতা সেন*]

জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত এরকম সুপ্রচুর বিশেষণ যা কখনও মানসলোকী, চিত্রল, কখনও বর্হিলোকস্থ, কখনও রহস্যময় অপর অর্থদ্যোতনা বহনকারী বা অন্তর্লোকবিহারী– মান্নান সৈয়দের যত্নশীল সমালোচনায় জীবনানন্দের কবিতালোকের বিশিষ্ট ও নতুন শব্দাম্বয় আবিষ্কৃত হয়েছে কবিত্বের নানা অধ্যয়নে অভিজ্ঞতায়। তাছাড়া, 'কবিতা বিশ্লেষণে উপযোগী নিজস্ব গদ্যরীতি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন তিনি।' (রফিকউল্লাহ, ২০০১ : ১১৮)। সমালোচক যেন তাঁর কবিমনকে ব্যুৎপন্ন করে নিতে পেরেছিলেন, কবিত্বের প্রখর সংবেদনায় জীবনানন্দের কবিতার কুশলী পাঠ কবিতাগুলোকে যেন আরো স্ফুটমান করে তোলে।

জীবনানন্দীয়-শব্দের প্রকৌশল ও সৃষ্ট উপমাকে অন্তরঙ্গ পাঠে নানা বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)। পাঠকের ইন্দ্রিয়চেতনায় 'অপরিসীমার বিস্তৃতি' নিয়ে আসে যে উপমাগুলো তা 'নতুন, নিজস্ব, সুদূরস্পর্শী, আবার তা যখন প্রচলিত, তখনো তার মধ্যে এমন মায়াবী স্পর্শ থাকে, যা একমাত্র জীবনানন্দ দাশই দিতে পারেন।' (হুমায়ুন, ২০০৫ : ৬৮)। কবিত্বের প্রধান শক্তি হিসেবে উপমার গুরুত্ব জীবনানন্দ যেভাবে দিয়েছেন, তা তাঁর শব্দ ব্যবহারের কলাপ্রকৌশলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হুমায়ুন আজাদের মতে :

> তাঁর কবিতা পরম পিপাসী স্বপ্নচারিতা, এ-স্বপ্নচারিতায় যা সহায়ক, সে-শব্দ তিনি আহরণ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, ভেঙেছেন, পুর্নসৃষ্টি করেছেন। এর ফলে গঠিত হয়েছে তাঁর একান্ত নিজস্ব শব্দসৌরলোক, নিসর্গের প্রতিটি সম্ভার তাঁর, বিশেষণের মোহনীয়তাও তাঁরই। (হুমায়ুন, ২০০৫ : ৬৪)

মাহবুব সাদিকের (১৯৪৭–) *জীবনানন্দ : কবিতার নান্দনিকতা* (২০০৪) গ্রন্থেও রয়েছে জীবনানন্দের কবিতার সমকাল, ইতিহাস-চেতনা, নারী, পুরাণ ভাবনা; রয়েছে চিত্রকল্প, রং, শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে প্রকরণধর্মী আলোচনা এবং জীবনানন্দের কাব্যে ব্যবহৃত পুরাণের সার্থকতা প্রসঙ্গ :

> জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসু– ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে এই চারজন পুরাণ প্রয়োগে পারঙ্গম। জীবনানন্দ দাশ পুরাণ ব্যবহারে শুধু অসাধারণ নৈপুণ্যই দেখাননি, তাঁর কবিতায় পুরাণের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে লোকপুরাণ ও ইতিহাসচেতনা। ... পুরাণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শাশ্বত মানবজীবনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে তাঁর কাব্যকলা সমৃদ্ধ হয়েছে। (মাহবুব, ২০০৪ : ১৮৯)

কবি হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) 'জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতি', 'সাম্প্রতিক জীবনচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার রূপরেখা'-সহ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতি' প্রবন্ধে হুমায়ুন কবির চিহ্নিত করেন জীবনানন্দের সৌন্দর্যপিপাসু রোমান্টিক মন; তুলনা করেছেন সমসাময়িক বিভিন্ন কবির সাথে, আবিষ্কার করেছেন জীবনানন্দের প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধ, মানবিকতার বোধ। তাঁর মতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি কবির অনুরাগের ধরন, নাগরিকতার চেতনা– সবই প্রায় স্বতন্ত্র স্বরে উদ্‌বোধিত।

কবি শাহাবুদ্দিন নাগরীর (১৯৫৫–) মতে, "জীবনানন্দ দাশের সত্যই ছিল সর্বমানুষের কল্যাণ ও মুক্তি। ... নন্দিত শব্দের প্রতি জীবনানন্দ অবহেলা দেখাননি এ যেমন সত্য কথা, তেমনি সত্য তাঁর কাব্যের নিসর্গতার ভেতর দিয়ে তিনি কামনা করেছেন মানবজাতির মঙ্গলের। এই মঙ্গলচিন্তাই পরিবর্তিত হয়ে জীবনানন্দের জীবনে মানবধর্ম এবং পরিশেষের ধর্মচিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (শাহাবুদ্দিন, ২০০১ : ২২০)।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য-সমালোচনায় কবি নন, এমন বিদগ্ধ সমালোচকের সংখ্যাও অনেক। আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত সমালোচনা-গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি, রয়েছে অসংখ্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-রচনাও। উল্লেখযোগ্য সমালোচকেরা হলেন অশোক মিত্র, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অম্বুজ বসু, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণ সেন, অমলেন্দু বসু, প্রভাতকুমার দাস, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, দীপ্তি ত্রিপাঠী, প্রদ্যুম্ন মিত্র, বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার মিশ্র, ক্লিন্টন বি. সীলি প্রমুখ। বাংলাদেশে জীবনানন্দের কবিতা বিষয়ে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ/নিবন্ধ রয়েছে আবদুল হাফিজ, রণেশ দাশগুপ্ত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যতীন সরকার, সনৎকুমার সাহা, আহমদ ছফা, আবুল কাসেম ফজলুল হক, বেগম আকতার কামাল, সিদ্দিকা মাহমুদা, অনীক মাহমুদ, সৈকত আসগর, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, আসাদুজ্জামান, সৈয়দা আইরিন জামান প্রমুখের। জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষে বাংলা একাডেমি কর্তৃক নিবেদিত পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' জন্মশতবর্ষ সংখ্যায় (এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯) রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক রচনা। তাছাড়া পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিন' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেছে জীবনানন্দ সংখ্যা। জীবনানন্দের কবি-মানস ও কাব্যসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোসহ উক্ত সমালোচকদের লেখায় বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর কাব্যে প্রকৃতিচেতনা, প্রেম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সময়-চেতনা, পরাবাস্তবতা, সমকাল-সমাজ এবং কাব্য-প্রকরণের বিভিন্ন দিক যথা– চিত্রকল্প, উপমা-শব্দ-ছন্দ এবং প্রধান বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের ও কবিতার বিশেষ আলোচনা।

জীবনানন্দের কাব্য-সমালোচনায় কবিদের সমালোচনা-কৃতি এই অনুভব জাগায় যে, কবির মর্মানুভূতি উদ্‌ঘাটনে তাঁরা কেউই ব্যর্থ নন। জীবনানন্দ লিখেছিলেন : "যাঁদের মন কবিতা-সৃষ্টির জন্যে তৈরি নয়, কাব্য-আলোচনায় তাঁরা পরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডিত্য, ভালো অন্তঃপ্রবেশ দেখাতে পারলেও কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের বোধ, আমার ভয় হচ্ছে, শেষ গভীরতা লাভ করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।" (জীবনানন্দ, ২০১৭ : ৮৩)। সমালোচনাতত্ত্বে বিশেষত কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক বিচারসূত্রে 'নিষ্কবি গদ্য-সমালোচকের' অজর দৃষ্টি কিংবা নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা বিষয়ে জীবনানন্দের নির্দ্বন্দ্ব স্বীকারোক্তি রয়েছে , তবু তিনি কবিতা সমালোচনায় কবির উদ্যোগকেই স্বাগত জানিয়ে আরো লিখছেন : "...কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত– সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে– কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়–মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার।" (জীবনানন্দ, ২০১৭ : ৮৯-৯০)। নিজের বা অন্যের কবিতার ব্যাখাতা হিসেবে কবিকে প্রয়োজনীয় মনে করার পেছনে সমকালে জীবনানন্দের কবিতার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। যে অভিজ্ঞান কবিতার জন্য দরকারি, 'কবির সেই জ্ঞানপরিসরের গভীরতর ও যুক্তি-অলোকিত দ্বিতীয় স্বরূপ' (জীবনানন্দ, ২০১৭ : ৮৯-৯০) অর্থাৎ সমালোচক-সত্তাকেও এ চিন্তায় নিবিষ্ট দেখতে চান জীবনানন্দ। মূলত, অপসমালোচনার ক্ষতি এড়াতেই এমনটা কামনা করেছিলেন তিনি। একজন কবির সৃষ্টিশীল চিত্তের অমলিন বিস্ময়, মুগ্ধতা– যা একজন সমালোচক বা সাধারণ পাঠকেরও আছে কিংবা আছে তীক্ষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণের বোধ। কবির সংবেদনায় জীবনানন্দ আবিষ্কার আর সমালোচকের প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গির জীবনানন্দ চর্চায় একটু পার্থক্য ঘটেই যায়; যদিও সবক্ষেত্রে তা সত্য নয়। জীবনানন্দের রহস্যময় কবিতাভুবনের আত্মমগ্ন নির্জন পাঠেই অধিক নান্দনিক আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন কবিরা। ফলে কবির পাঠে কোথাও কোথাও সে অবলোকন হয়েছে 'ইমপ্রেশনিস্টিক', যেভাবে সমালোচনা হয়ে ওঠে নব সৃজনের আনন্দময় নির্মাণ। এভাবে 'কবি কিংবা ঔপন্যাসিকের মধ্যে জীবনানন্দ বিষয়ক আবিষ্কার ঘটেই চলেছে'– (দেবেশ, ১৯৯৬ : ১৪৮)। তাই কবি জীবনানন্দ নির্মিত হতে থাকেন; তাঁর ইতিহাস পরিক্রমা, দেশ-কাল-সমাজ সংলগ্নতা কিংবা বিচ্ছিন্নতার ভিন্নতর ব্যাখার সাথেই গৃহীত হয় তাঁর ব্যবহৃত শব্দ, চিত্রকল্প, উপমার নব নব সৃজনী-পাঠ ।

কবি যেভাবে জীবনানন্দকে পড়েন, সেটা বেশিরভাগই কবিতার দিকে কবির অভিযাত্রার সঙ্গী হবার মতন, কবিদৃষ্টির ব্যাপকতায় আকৃতি পাওয়া শিল্পের অনুভব যেখানে প্রবল। কবির জীবনদর্শন, প্রতীক, ইতিহাসচেতনা ও ঐতিহ্যবাদ, নবতর মানবচেতনা,

জীবনসত্যের পরিবর্তিত মাত্রা ও রূপ প্রভৃতি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তাঁর কবিতাতেই, কবিকৃত সমালোচনায় এই বোধগুলোকে জীবনানন্দের কবিতায় সঞ্চারিত এক সমগ্রতা হিসেবে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা রয়েছে। জীবনানন্দের খণ্ড পাঠ-ও সে কারণে কাম্য নয় অনেকের কাছে। কবিরা তাঁর সে চেতনাজগত থেকে নিয়েছেন দীক্ষা। সমকালে যে মুদ্রাদোষ কবিকে আলাদা করেছিল এবং যে কারণে কবি হয়েছিলেন প্রত্যাখ্যাত, উত্তরকালে জীবনানন্দের কবিতার মূল্যায়নে মৃত্যুর, ব্যাথার, নিরাশ্বাসের, ক্লান্তির, জীবন-উৎকণ্ঠার, ক্ষয়ের কবি হিসেবে তাঁর একটি সহজ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সমালোচক-কবিদের কেউ কেউ জীবনানন্দের এই অপূর্ণ-খণ্ড পাঠকে অস্বীকার করেছেন। অনড় ও অপরিবর্তনীয় জিজ্ঞাসায় নয়, বরং চেয়েছেন চিরকালীনের পটভূমিকায় সমসাময়িকের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাঁর কাব্যকে চিহ্নিত করতে। এছাড়া তিরিশের দশকের আধুনিক সাহিত্যে যে প্রশ্নাতুর বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সময়, সমাজ-জীবন, দর্শন ও সম্পর্কের ব্যাখ্যায়; সেই দিকটা গুরুত্ব দিয়ে জীবনানন্দের কাব্য-প্রচেষ্টা থেকে কবিরাও চেয়েছেন ক্রম-পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত সময়ের অভিযাত্রায় তাঁর/তাঁদের শিল্প-নির্মাণকল্পের প্রেরণা, প্রবণতা কিংবা স্বাতন্ত্র্যকে মিলিয়ে নিতে। কাব্য নির্মাণকলার বা শৈলী বিচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিরা টুকরো বিশ্লেষণের চেয়ে কবিতার উপলব্ধির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশি। জীবনানন্দের ব্যবহৃত অক্ষর, শব্দ, বিশেষণ, অব্যয় কিংবা ক্রিয়াপদের ভাব ও অর্থজ্ঞাপকতার নৈপুণ্য প্রমাণে শৈলীবাদীদের মত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকেও পছন্দ করেছেন কেউ। কিন্তু সর্বোপরি সমালোচকের নিবিড় অধ্যয়নে সংলগ্ন-সমগ্র পাঠ-ই মূর্ততা ও বিমূর্ততা নিয়ে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় কখনও পারম্পর্যহীন পঙ্‌ক্তি কিংবা ব্যবহৃত এমন শব্দ যা উপমা বা রূপকও নয়, তেমন ক্ষেত্রে সমন্বয় ও উপলব্ধির কিংবা অর্থের সংযুক্তির যোগসূত্র নির্মিত হয়েছে সমালোচনায়। এভাবেই জীবনানন্দ দীর্ঘ সময় ধরে কবিকুলের বিশেষত তরুণ কবির আরাধ্য হয়েছেন। বাংলা কবিতার একটা বড় অংশ অনেকটা সময় ধরে জীবনানন্দীয় ধারায় প্রবাহিতও হয়েছে। জীবনানন্দ যেন আধুনিক সময়ে রোমান্টিকতার ভাব বা মতাদর্শকে কাব্যবিশ্বে 'ধ্রুপদী' করে তুললেন; ফলে আধুনিক ও আধুনিকোত্তর সময়ে তাঁর কাব্যভাবনা, কাব্যরীতি সংবেদনশীল পাঠকের কাছে শেষাবধি মুগ্ধতা, বিস্ময় ও রহস্যময়তার উৎসভূমি হিসেবেই থেকে যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (২০০৭)। *জীবনানন্দ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০১)। 'বৃত্ত যেভাবে সম্পূর্ণ হল'। *জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল হাসনাত], অবসর, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১১)। *শুদ্ধতম কবি*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

জহর সেনমজুমদার (১৯৯৯)। *জীবনানন্দ ও পদচিহ্নময় অন্ধকার*। পাণ্ডুলিপি, কলকাতা-৭৩।

জহর সেনমজুমদার (২০১০)। 'আজকের জীবনানন্দ, কালকের জীবনানন্দ'। *জীবনানন্দ দাশ মূল্যায়ন ও পাঠোদ্ধার* [সম্পা. আবু হোসেন শাহরিয়ার], সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ (২০১৭)। *কবিতার কথা* [সম্পা. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দেবেশ রায় (১৯৯৬)। 'অন্য এক আরম্ভের অপেক্ষায়।' *এই সময় ও জীবনানন্দ* [সম্পা. শঙ্খ ঘোষ], সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

পূর্ণেন্দু পত্রী (১৪০১)। *ঝরা পালক আবার*। কোরক সাহিত্য পত্রিকা (সম্পা. তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মণ), জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা-৫৯।

প্রভাতকুমার দাস (২০০৮)। 'প্রগতি ও কবিতা-র উজ্জ্বল অধিনায়ক : বুদ্ধদেব বসু'। *বুদ্ধদেব বসু : সঙ্গ-প্রসঙ্গ* [সম্পা. গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়], পত্রলেখা, কলকাতা।

বিনয় মজুমদার (১৪০১)। *জীবনানন্দ ও আমি : কিছু অসংলগ্ন ভাবনা*। কোরক সাহিত্য পত্রিকা [সম্পা. তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মণ], জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা-৫৯।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৭)। *কালের পুতুল*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. , কলিকাতা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৮)। *জীবনানন্দ : কথার গর্বে কবিতা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মাহবুব সাদিক (২০০৪)। *জীবনানন্দ : কবিতার নান্দনিকতা*। নবযুগ, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০১)। 'বাংলাদেশে জীবনানন্দ-চর্চা'। *জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল হাসনাত], অবসর, ঢাকা।

শঙ্খ ঘোষ (১৪০৫)। *জীবন মৃত্যুর শব্দ শুনি*। বিভাব [সম্পা. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত], জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ (২০১৪)। 'সময়ের সমগ্রতা'। *জীবনানন্দ দাশ মূল্যায়ন ও পাঠোদ্ধার* [সম্পা. আবু হোসেন শাহরিয়ার], সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০১)। 'অসীমের সৈকতে'। *জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল হাসনাত], অবসর, ঢাকা।

শাহাবুদ্দীন নাগরী (২০০১)। 'জীবনানন্দ : উত্তর প্রজন্মের কবি'। *জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবুল হাসনাত], অবসর, ঢাকা।

সমীর সেনগুপ্ত (২০০৮)। *বুদ্ধদেব বসুর জীবন*। বিকল্প, কলকাতা।

সুজিত সরকার (১৪০১)। *জীবনানন্দের প্রভাব*। কোরক সাহিত্য পত্রিকা (সম্পা. তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায়বর্মণ), জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা-৫৯।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৫)। *আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য*। মাটিগন্ধা, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। *আধার ও আধেয়*। আগামী, ঢাকা